নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

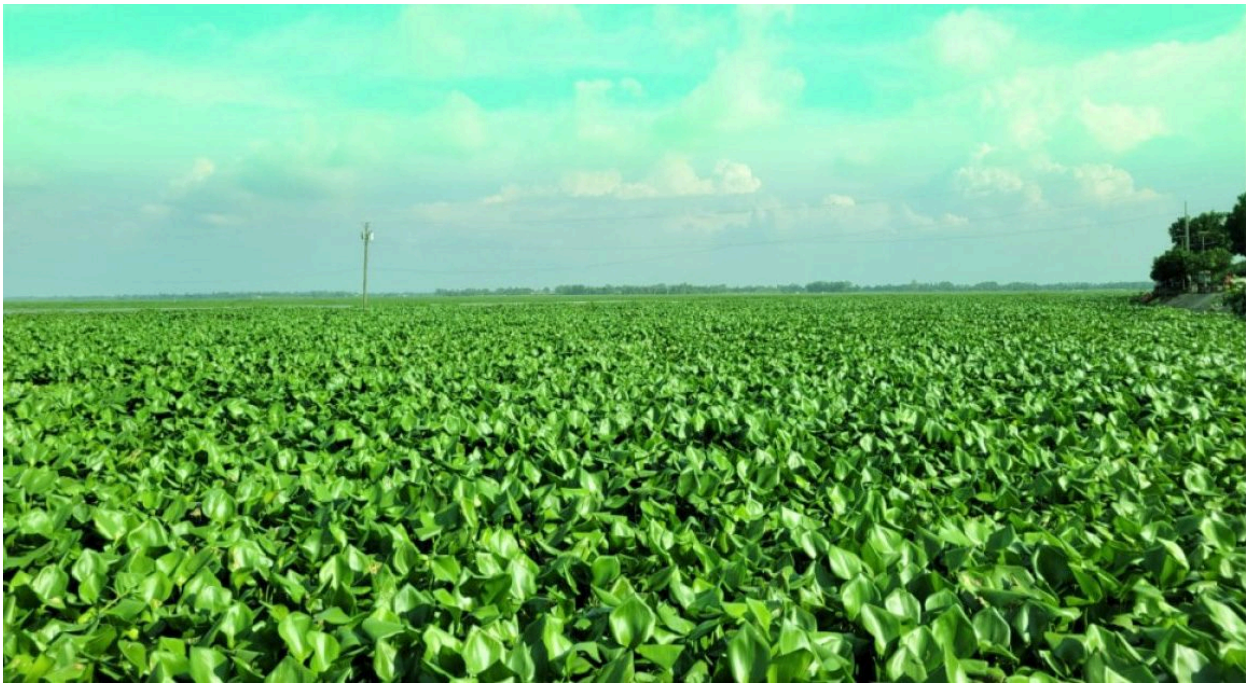
The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

কৃষক ও কৃষি

চলনবিলের অভিশাপ কচুরিপানা খুলে দিতে পারে সম্ভাবনার দুয়ার

চলনবিল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কচুরিপানা পাওয়া যায়, তাই সেখানে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপন করে কচুরিপানা থেকে কাগজ তৈরির প্রকল্প চালু করা হলে তা স্থানীয় অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। পরিকল্পিতভাবে কচুরিপানাকে ব্যবহার করতে পারলে চলনবিলের অভিশাপ কচুরিপানা খুলে দিতে পারে সম্ভাবনার দুয়ার।

নিজস্ব প্রতিবেদক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৬ ৭ মিনিট পাঠ



তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা প্রদেশে (বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) কচুরিপানা প্রথম পাওয়া যায় ১৯ শতকের শেষভাগে, মূলত ১৮৮৪ সালের দিকে। ১৫০ বছর পূর্বে এ অঞ্চলে এই উদ্ভিদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এটি মূলত দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন বনাঞ্চল ও ব্রাজিলের জলজ উদ্ভিদ। স্কটিশ পাট ব্যবসায়ী জর্জ মরগান (মতান্তরে জনৈক পর্যটক) ব্রাজিলে

এর হালকা বেগুনি রঙের অর্কিড-সদৃশ সুন্দর ফুল দেখে মুগ্ধ হন। তিনি বাগান সাজানোর শখে এটি এ প্রদেশে নিয়ে আসেন। ১৮৯০-এর দশকের দিকে এটি কলকাতার বোটানিক গার্ডেনে স্থান পায় এবং সেখান থেকে শৌখিন মানুষের হাত ধরে পূর্ব বাংলার জলাশয়গুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এই উদ্ভিদ অত্যন্ত দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। ফলে ১৯২০ সালের মধ্যে বাংলার প্রায় প্রতিটি নদ-নদী, খাল-বিল ও হাওড়-বাঁওড় কচুরিপানায় পুরোপুরি ঢেকে যায়। এই লাগামহীন বিস্তারের কারণে একে পরবর্তীতে "বাংলার সন্ত্রাস" (Terror of Bengal) নামে অভিহিত করা হতো।

কচুরিপানার কারণে মানুষের আয়ের ও দেশের অর্থনীতির যে বিশাল আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল, ১৯২০ ও ৩০-এর দশকে বাংলার প্রধান দুটি অর্থকরী ফসল ছিল আমন ধান ও পাট। বর্ষাকালে কচুরিপানার বিশাল স্তূপ ভেসে এসে ফসলি জমি ও ধানের ক্ষেত ঢেকে ফেলত। ১৯২৬ সালের একটি সরকারি কৃষি প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতি বছর শুধুমাত্র কচুরিপানার আগ্রাসনের কারণে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ আমন ধান পুরোপুরি নষ্ট হতো। ফলে কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের বাজারমূল্য বা নগদ টাকার বিশাল ক্ষতি হতো এবং বাংলায় বড় ধরনের খাদ্য সংকট দেখা দিত। এছাড়াও কচুরিপানা খুব দ্রুত নদীর উপরিভাগ ঢেকে ফেলে পানি থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন শুষে নিত এবং সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা দিত। এর ফলে নদী ও বিলের মাছ দলে দলে মারা যেত। মাছ বিক্রি করে যে গ্রামীণ পরিবারগুলো জীবিকা নির্বাহ করত, তাদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড় আর্থিক মন্দা তৈরি করে। তৎকালীন সময়ে বাংলায় পণ্য আনা-নেওয়া বা বাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম ছিল নদীপথ। পাটের মৌসুমে নদী ও খালগুলো কচুরিপানায় জট পেকে বন্ধ হয়ে যেত। পাট বোঝাই নৌকা সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারত না। এতে ব্যবসায়ী ও কৃষকদের সময়মতো পণ্য বিক্রি না হওয়ায় বিপুল পরিমাণ আর্থিক লোকসান গুনতে হতো। বর্ষাকালে ঘাস তলিয়ে গেলে গবাদিপশুরা বাধ্য হয়ে কচুরিপানা খেত। এতে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রচুর গরু-মহিষ মারা যেত। কৃষিপ্রধান বাংলায় তখন চাষাবাদের জন্য বলদ বা গবাদিপশুর অভাব দেখা দেয়, যা পরোক্ষভাবে কৃষকদের নতুন করে ঋণের জালে জড়াতে বাধ্য করে।

১৯৩৬ সালে শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের রাজনৈতিক দলের নাম ছিল কৃষক প্রজা পার্টি (KPP)। এই দলের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাকে কচুরিপানামুক্ত করার বিশেষ ঘোষণা ছিল। ১৯৩৬ সালে রূপরেখা তৈরি করে ১৯৩৭ সালের গোড়ার দিকে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জয়ী হয়ে ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ও নির্দলীয়দের জোটবদ্ধ যে সরকার গঠিত হয়, তা ইতিহাসে "প্রথম ফজলুল হক মন্ত্রিসভা" বা

"কৃষক প্রজা পার্টি-মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার" নামে পরিচিত। ১৯৩০-এর দশকে অবিভক্ত বাংলার নদীনালা ও ফসলি জমি (বিশেষ করে আমন ধান ও পাটের ক্ষেত) কচুরিপানার তীব্র বিস্তারে প্রায় ধ্বংসের মুখে পড়েছিল। এতে নৌযোগাযোগ স্থবির হয়ে পড়ে এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কৃষকদের এই চরম দুর্দশা লাঘবে ফজলুল হক তাঁর দলের ইশতেহারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রাখেন। শেরেবাংলা তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় বাংলার কৃষি ও অর্থনীতি সচল করতে "বাংলাকে কচুরিপানামুক্ত করার" ঐতিহাসিক অঙ্গীকার করেন। নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর তিনি 'বেঙ্গল ওয়াটার হাইসিন্থ অ্যাক্ট' বা কচুরিপানা আইন পাস করেন এই আইনের মাধ্যমে নিজ বাড়ির আশেপাশে কচুরিপানা রাখা নিষিদ্ধ করা হয়। সরকারি উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করে নদী ও জলাশয় থেকে কচুরিপানা পরিষ্কার করাকে বাধ্যতামূলক নাগরিক কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে সমগ্র বাংলায় এই নির্মূল অভিযান সফলভাবে পরিচালিত হয়েছিল।
নাটোরের সিংড়া অঞ্চলে অবস্থিত দেশের বৃহত্তম চলনবিলে সম্প্রতি কচুরিপানার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি ও স্থায়ী জট তৈরি হয়েছে। সিংড়ার ১২ টি ইউনিয়ন গুলোর মধ্যে ডাহিয়া, চৌগ্রাম, তাজপুর, শেরকোল ও ইটালি ইউনিয়নের মতো বিল এলাকাগুলোর হাজার হাজার হেক্টর ফসলি জমি এখন কচুরিপানার দখলে চলে গেছে।
চলনবিলে কচুরিপানা বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় কারণ হলো পানির প্রবাহ কমে যাওয়া। বিলের বিভিন্ন পয়েন্টে অপরিকল্পিতভাবে গ্রামীণ রাস্তাঘাট ও ক্রস-বাঁধ নির্মাণের ফলে পানি চলাচলের পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। যেমন নাটোর হতে সান্তাহার রেলপথ, নাটোর-বগুড়া মহাসড়ক, সিংড়া চলনবিল হতে তারাশ, জামতলী হতে বামিহাল, চৌগ্রাম হতে কালীগঞ্জ, হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়ক। এছাড়া এক গবেষণায় দেখা গেছে চলনবিলে প্রতিবছর প্রায় ১-৩ ইঞ্চি পরিমাণ পলি পরে জমি উঁচু হয়ে যাচ্ছে। ফলে চলনবিলে পতিত বিভিন্ন নদ-নদীর মুখ পলি জমে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্ষার পানি কোনো স্রোত তৈরি করতে পারে না। পানির স্রোত না থাকায় উজান থেকে ভেসে আসা কচুরিপানাগুলো নদীর বুক বেয়ে নেমে যেতে পারে না, ফলে সেগুলো বিলের ভেতরের কৃষিজমি ও জলাশয়ে স্থায়ীভাবে আটকে থেকে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করছে। চলবিল অঞ্চলের পরিবেশ আন্দোলনকারী ও স্থানীয় কৃষকদের মতে, কিছু অসাধু মৎস্যজীবী বিলে মাছ ধরার জন্য আড়াআড়িভাবে অবৈধ সোঁতিজাল এবং বাঁশের বেড়া বা পাটা ব্যবহার করেন। বর্ষা ও বন্যার পানির সাথে যে কচুরিপানাগুলো স্বাভাবিক নিয়মে ভেসে যাওয়ার কথা ছিল, সেগুলো এই সোঁতিজালে আটকে পড়ে। ফলস্বরূপ, সিংড়ার চলনবিল অংশে মাইলের পর মাইল জুড়ে কচুরিপানার বিশাল ও জমাটবদ্ধ 'জট' বা স্তূপ তৈরি হয়।

কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চলনবিল অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঘন ঘন ও অসময়ে দীর্ঘস্থায়ী বন্যা হচ্ছে। বন্যার পানি দীর্ঘ সময় ধরে বিলে স্থির হয়ে থাকায় এবং বিল থেকে পানি নিষ্কাশন ব্যাহত হওয়ায় কচুরিপানা বংশবিস্তার করার জন্য প্রচুর সময় ও অনুকূল পরিবেশ পাচ্ছে।

চলনবিল একটি অত্যন্ত উর্বর শস্যভাণ্ডার। প্রতি বছর বোরো ও আমন চাষে কৃষকেরা জমিতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ও ফসফেট জাতীয় রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন। বর্ষার পানিতে যখন এই সারের অবশিষ্টাংশ ধুয়ে বিলের পানিতে মেশে, তখন পানিতে পুষ্টি উপাদানের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায় (যাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় Eutrophication বলা হয়)। এই পুষ্টি উপাদান কচুরিপানার জন্য চমৎকার খাদ্য হিসেবে কাজ করে, যার ফলে একটি কচুরিপানা মাত্র কয়েক দিনে জ্যামিতিক হারে দ্বিগুণ-তিনগুণ রূপ ধারণ করে। এর ফলে কৃষকের অপচয় ও অপসারণে বাড়তি খরচ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। বিলের এক বিঘা জমি থেকে কচুরিপানা সরাতে কৃষকদের অতিরিক্ত ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত গুনতে হচ্ছে। অনেক দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের পক্ষে এই বিশাল টাকা খরচ করে সময়মতো কচুরিপানা পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। ফলে জমিগুলো অনাবাদি পড়ে থাকে এবং সেখানে কচুরিপানাগুলো আরও বেশি ডালপালা মেলার সুযোগ পায়।

চলনবিলকে কচুরিপানার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে দীর্ঘমেয়াদী ও সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। চলনবিল বাংলাদেশের একটি বিশাল এবং ঐতিহ্যবাহী জলাভূমি, তাই এখানে কেবল প্রথাগত উপায়ে কচুরিপানা পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। ভৌগোলিক ও পরিবেশগত দিক বিবেচনা করে চলনবিলে কচুরিপানা দমনে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যেমন-

১. আধুনিক ড্রেজার ও হারভেস্টর মেশিনের ব্যবহার- চলনবিল অনেক বড় হওয়ায় হাত দিয়ে কচুরিপানা পরিষ্কার করা সময়সাপেক্ষ ও কঠিন। সরকারি অর্থায়নে আধুনিক উইড হারভেস্টর (Weed Harvester) বা জলজ আগাছা কাটার মেশিন ব্যবহার করে দ্রুত বিস্তীর্ণ এলাকার কচুরিপানা কেটে ফেলা সম্ভব। এছাড়া বিলের প্রধান প্রবেশপথ বা সংযোগ খালগুলোতে কচুরিপানা আটকে রাখার জন্য বিশেষ ধরনের ফ্লোটিং ব্যারিয়ার (ভাসমান বেড়া) ব্যবহার করা যেতে পারে, যেন কচুরিপানা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

২. সংযোগ খালের নাব্য ও স্বাভাবিক স্রোত পুনরুদ্ধার- কচুরিপানা সাধারণত আবদ্ধ বা ধীরগতির পানিতে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। চলনবিলে পলি জমার কারণে এবং অপরিকল্পিত বাঁধ বা স্লুইসগেটের ফলে অনেক জায়গায় পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। বিলের সাথে

যুক্ত প্রধান নদী ও খালগুলো খনন (Dredging) করে পানির স্বাভাবিক স্রোত ফিরিয়ে আনলে কচুরিপানা এক জায়গায় জমে থাকতে পারবে না এবং বর্ষার পানির টানে নেমে যাবে।

৩. ব্যাপক হারে কম্পোস্ট বা জৈব সার উৎপাদন- চলনবিল অঞ্চলের একটি বড় অংশ জুড়ে ইরি-বোরো ধানের চাষ হয়। কচুরিপানা নাইট্রোজেন ও পটাশিয়াম সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি দিয়ে অত্যন্ত উন্নত মানের জৈব সার বা কম্পোস্ট তৈরি করা সম্ভব। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকদের কচুরিপানা দিয়ে দ্রুত কম্পোস্ট সার তৈরির প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে। এতে কৃষকদের রাসায়নিক সারের খরচ কমবে এবং বিলও কচুরিপানা মুক্ত হবে।

৪. "কচুরিপানা নিধন সপ্তাহ" ও জনসচেতনতা- চলনবিল এলাকার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এটি সফল করা সম্ভব নয়। স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে বর্ষার শুরুতে বা পানি কমার সময়ে "চলনবিল রক্ষা ও কচুরিপানা নিধন সপ্তাহ" ঘোষণা করা যেতে পারে। স্থানীয় মৎস্যজীবী সমিতি, কৃষক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নিজ নিজ এলাকার খাল ও বিলের অংশ পরিষ্কার রাখার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে।

৫. বাণিজ্যিক ও হস্তশিল্পে ব্যবহারের উদ্যোগ (উদ্যোক্তা তৈরি)- কচুরিপানাকে উপদ্রব না ভেবে একে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। চলনবিল অঞ্চলের বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কচুরিপানা থেকে মাদুর, ব্যাগ, ঝুড়ি, পাপোশ ও বিভিন্ন নান্দনিক আসবাবপত্র তৈরির ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের কিছু এলাকায় কচুরিপানার হস্তশিল্প বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। বিল পাড়ের মানুষ যদি বুঝতে পারে কচুরিপানা বিক্রি করে টাকা আয় করা সম্ভব, তবে তারা নিজ দায়িত্বেই বিল থেকে কচুরিপানা সংগ্রহ করবে।

৬. কাগজ তৈরিতে কচুরিপানা ব্যবহার করতে হবে। কচুরিপানায় প্রচুর পরিমাণে সেলুলোজ (Cellulose) বা আঁশ থাকে, যা কাগজ তৈরির মূল কাঁচামাল। কাঠের তুলনায় কচুরিপানা থেকে অনেক কম খরচে এবং পরিবেশবান্ধব উপায়ে কাগজের মণ্ড বা পাল্প (Pulp) তৈরি করা যায়।

কচুরিপানা থেকে উৎপাদিত কাগজ সাধারণ কাগজের চেয়ে কিছুটা মোটা ও বেশ শক্ত হয়। এই কাগজ দিয়ে সাধারণত ফটোগ্রাফি ফ্রেম ও ডায়রি কভার, শপিং ব্যাগ ও কার্টন (প্যাকেজিং বক্স), শুভেচ্ছা কার্ড (Greeting Cards) ও ভিজিটিং কার্ড, ডিম রাখার ট্রে ও ওয়ান-টাইম প্লেট-বাটি তৈরি করা যায়।

চলনবিল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কচুরিপানা পাওয়া যায়, তাই সেখানে সরকারি বা বেসরকারি

উদ্যোগে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপন করে কচুরিপানা থেকে কাগজ তৈরির প্রকল্প চালু করা হলে তা স্থানীয় অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। পরিকল্পিতভাবে কচুরিপানাকে ব্যবহার করতে পারলে চলনবিলের অভিশাপ কচুরিপানা খুলে দিতে পারে সম্ভাবনার দুয়ার।